আব্দুল বায়েস

উন্নয়নের পঞ্চাশ বছর : নিরাশার সাগরে আশার তরী

সদানন্দ ধুমে নামে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক সাংবাদিকের ২০১০ সালে দেয়া মন্তব্য এখনো কানে বাজে—'প্রায় ৪০ বছর আগে একমাত্র একজন অসংযত আশাবাদী অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ পাকিস্তানের বিপক্ষে বন্যাপ্রবণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পক্ষে বাজি ধরত। কিন্তু উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার, নিম্নগামী জন্মহার এবং আন্তর্জাতিক স্তরে একটা অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি নিয়ে বিগত বাস্কেট কেস হয়তো শেষ হাসিটা দেবে।'

আসলে কি তাই?

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) সম্প্রতি আয়োজন করল উন্নয়ন সম্পর্কিত বার্ষিক সম্মেলন (অ্যানুয়াল বিআইডিএস কনফারেন্স অন ডেভেলপমেন্ট, এবিসিডি ২০২১)। তিন দিনব্যাপী ব্যাপক আলোচনায় অংশ নেন দেশের ভেতরের ও বাইরের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি। সবার মনে থাকার কথা যে স্বাধীনতার মাত্র কিছুদিন পর দুটি মন্তব্য সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট না করে থাকলেও অন্তত মসৃণ অগ্রগতির আশায় চিড় ধরিয়ে ছিল। এর একটি হচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে হেনরি কিসিঞ্জারের অপমানজনক মন্তব্য 'তলাবিহীন ঝুড়ি' এবং ইউসট ফাল্যান্ড ও জে পারকিনসনের কিছুটা সংবেদনশীল অথচ বিতর্কর বক্তব্য—'বাংলাদেশে উন্নয়ন ঘটলে পৃথিবীর কোনো দেশ উন্নয়ন ছাড়া থাকবে না।' উইনস্টন চার্চিল বলতেন, ভালো সংকট অপচয় করতে নেই। হয়তো সংকটই বাংলাদেশের আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল, কে জানে।

কনফারেন্সের কথায় আসা যাক। প্রারম্ভিক মন্তব্যে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রার একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরলেন প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন কেন বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে উন্নয়ন ব্যতিক্রম বা উন্নয়ন ধাঁধা হিসেবে বিবেচিত। তাঁর মতে, বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে শুরুতে যে হতাশার সুর শোনা গিয়েছিল তা মূলত তিনটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে, যথা (ক) কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রসারের ঘাটতি, বৈষম্যমূলক কৃষি কাঠামো এবং তীব্র খাদ্যস্বল্পতা ও গণদারিদ্র্য; (খ) জনমিতিক জগতে নব্য ম্যালথুসিয়ান নিরাশা, নারীর নিচু শিক্ষা, সামাজিক বা পেশাগত অবস্থান ও ভয়েস এবং (গ) বাজার ব্যবস্থার দুর্বলতা—ব্যক্তি উদ্যোক্তার অভাব, দুর্বল রাষ্ট্রে দুর্বল শিল্পনীতি, প্রাথমিক পণ্যের আধিক্যে রফতানি হতাশা ইত্যাদি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে পরবর্তী সময়ে হতাশাবাদ হটিয়ে আশাবাদের আগমন ঘটেছিল বাংলাদেশের বেলায়। এখন বাংলাদেশের বয়স ৫০ যখন অতীতের আর্থসামাজিক মূল্যায়নগুলোর পুনর্বিবেচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। লেখকের ধারণা, হতাশা থেকে সফলতার সঙ্গে আশায় উত্তরণের বাংলাদেশের অভিযাত্রাকে মূলত দুটি পথে পরীক্ষা করা যেতে পারে। প্রথমত, এ অঞ্চলের অন্যদের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা—যেমন পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে—বিশেষত ১৯৯০-২০ সময়কালে পাকিস্তান ও ভারতের অগ্রগতি বনাম বাংলাদেশের অগ্রগতির গতিপথ অনুসরণ করা—প্রয়োজনে পুরো সময়কে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে পূর্ব জারিত/প্রত্যাশিত ও প্রকৃত ফলাফলের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ। নির্দিষ্টভাবে দেয় আয়স্তরে বাংলাদেশের প্রকৃত অগ্রগতির সঙ্গে এর প্রক্ষেপিত অগ্রগতির তুলনা করা, তবে বিবেচনায় নিতে হবে অন্যান্য নিম্ন, নিম্ন ও নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের অভিজ্ঞতাও।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, বিনায়ক সেনের উপস্থাপিত পরিসংখ্যানপ্রসূত প্রধান পর্যবেক্ষণ কিছুক্ষণের জন্য হলেও শ্রোতা বা পাঠককে পিনপতন নীরবতায় নিজ নিজ আসনে ধরে রেখেছিল বৈকি। বলা বাহুল্য, আপাতদৃষ্টে স্বাধীনতার পরবর্তী ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিবরণী আরব্য রজনীর আখ্যান মনে হতেই পারে কারো কাছে।

প্রথমে ধরা যাক বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের তুলনা। পাকিস্তান আমলে বিচ্যুতি ছিল অগ্রগতিতে, পশ্চিম এগিয়ে ছিল আর পূর্ব অনেক পিছিয়ে। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ। এখনো বিচ্যুতি লক্ষণীয়—বস্তুত বাড়ন্ত বিচ্যুতি, তবে এবার উল্টো দিকে, অর্থাৎ বাংলাদেশ অগ্রগামী পাকিস্তানের চেয়ে নানান নির্দেশকে। স্বাধীনতার সময় প্রায় সব আর্থসামাজিক নির্দেশকে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পিছিয়ে ছিল; ২০১০ শতকের শেষে এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে টপকে গেছে বলে ধারণা দিলেন বিনায়ক সেন।

বাংলাদেশ বনাম ভারতের তুলনাটা এ রকম: কিছু ক্ষেত্রে ছুঁইছুঁই, অন্য ক্ষেত্রে এগিয়ে। যেমন জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার, নগরায়ণের হার ইত্যাদিতে ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য নির্দেশকে দ্রুত ধাবমান সেই দেশটির সমান হতে।

তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে বাংলাদেশের বড় ধরনের ঘুরে দাঁড়ানোর ঘটনা ঘটে ২০১০ শতকের সময়কালে।

পরিসংখ্যান দিয়ে ব্যাপারগুলো পরিষ্কার করা যাক। ধরুন, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনআই পাকিস্তানের মাথাপিছু জিএনআইয়ের ৫৫ শতাংশ ছিল অথচ ২০১০ দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনআই। অন্যদিকে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনআই ছিল ভারতের ৮৭ শতাংশ, পার্থক্যটা বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার দশকে দাঁড়ায় ৭৪ শতাংশ কিন্তু ২০১০-এর শেষ দিকে হ্রাস পেয়ে ৮২ শতাংশ—'ক্যাচিং আপ' ইন্ডিয়া সিনড্রোম!

বাংলাদেশে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনের ক্রমবর্ধমান অবদান আছে এবং ২০১০ দশক শেষে এ হিস্যা প্রায় ২০ ভাগ দাঁড়ায়। এর বিপরীতে ভারত ও পাকিস্তানে ওঠানামা নিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান যথাক্রমে ১৩ ও ১১ শতাংশ। এটা ব্যাখ্যা করে কী করে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক নির্দেশকে আঞ্চলিক সহগামীর নাগাল ধরল। আর ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সফলতা প্রতিফলিত হতে দেখা যায় নগরায়ণের সফলতায়—নব্বইয়ের দশকে সবচেয়ে কম নগরায়ণ থেকে আঞ্চলিক অংশীদারদের ছাপিয়ে যাওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয় (অপরিকল্পিত যদিও এবং অন্যান্য সমস্যা থাকা সত্ত্বেও)। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক প্রতিবেশীদের তুলনায় নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের সংগতিপূর্ণ হার বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে জ্বালানি জুগিয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সফলতা—তুলনীয় সময়ে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ থেকে ৩৬ শতাংশ, ভারতে ৩০ থেকে ২১ এবং পাকিস্তানে ১৪-২৩ শতাংশ।

সামাজিক নির্দেশকে সার্বিক পর্যবেক্ষণ অমর্ত্য সেনের বিশ্লেষণে উঠে এলেও বিনায়ক সেন তার স্বকীয় ধারায় দেশগুলোর অবস্থান তুলে ধরেছেন। বলতে চেয়েছেন যে অধিকাংশ সামাজিক নির্দেশকে পাকিস্তানের আগে অবস্থান বাংলাদেশের শিশুমৃত্যু হার, মাতৃমৃত্যু হার, মোট প্রজনন হার, প্রত্যাশিত আয়ু, বয়স্ক সাক্ষরতা (মোট এবং নারী), মেয়েদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি। বস্তুত, যখন জ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেন মনে করেন, এসব নির্দেশকের ক্ষেত্রে ভারতসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাংলাদেশ পথপ্রদর্শক তখন গর্বে বাংলাদেশীর বুক ভরে ওঠে বৈকি।

> ইদানীং বাংলাদেশের অগ্রগতি অন্যদের চেয়ে ভালো। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে প্রত্যাশিত আয়ু সবচেয়ে কম ছিল বাংলাদেশে ৫৮ বছর, এখন প্রায় ৭৩ বছর। আর সে সময় পাকিস্তানে ছিল সবচেয়ে বেশি ৬০ বছর, এখন ৬৭ বছর; ভারত ৫৭ থেকে ৭০-এ তুলতে পেরেছে। অর্থাৎ পাকিস্তান ও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষ বেশিদিন বাঁচে এখন। অন্যদিকে মোট এবং নারী বয়স্ক সাক্ষরতায় ভারতের পেছনে থেকেও এখন ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

এবার সামাজিক নির্দেশকের তুলনামূলক আলোচনায় একটু নির্দিষ্ট হওয়া যাক। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ভারতের তুলনায় শিশুমৃত্যু হার বাংলাদেশে বেশি থাকা সত্ত্বেও ২০০০ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের নিচে শিশুমৃত্যু হার নামাতে পেরেছে (বাংলাদেশ প্রতি হাজারে ১০০ থেকে ২৬, ভারত ৯৯ থেকে ২৮ এবং পাকিস্তান ১০৭ থেকে ৫৫)। পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে একই প্রবণতা লক্ষণীয়, যেমনটি মোট প্রজননের ক্ষেত্রে নব্বইয়ের শুরুতে প্রতিবেশী দুই দেশের তুলনায় বেশি থেকেও ইদানীং সবচেয়ে কম। খর্বকায় অনুপাত নব্বইয়ের দশকে প্রতিবেশী দেশ দুটো থেকে বেশি নিয়ে যাত্রা শুরু কিন্তু ইদানীং বাংলাদেশের অগ্রগতি অন্যদের চেয়ে ভালো। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে প্রত্যাশিত আয়ু সবচেয়ে কম ছিল বাংলাদেশে ৫৮ বছর, এখন প্রায় ৭৩ বছর। আর সে সময় পাকিস্তানে ছিল সবচেয়ে বেশি ৬০ বছর, এখন ৬৭ বছর; ভারত ৫৭ থেকে ৭০-এ তুলতে পেরেছে। অর্থাৎ পাকিস্তান ও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষ বেশিদিন বাঁচে এখন। অন্যদিকে মোট এবং নারী বয়স্ক সাক্ষরতায় ভারতের পেছনে থেকেও এখন ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, যেমন করে মেয়েদের প্রাথমিক স্কুলে অন্তর্ভুক্তিতে। তবে মাধ্যমিকে মধ্যখানে পা পিছলালেও আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারতকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ।

গেল তিন দশকে চিত্তাকর্ষক চিত্র দারিদ্র্য হ্রাসের বেলায়—চরম দারিদ্র্য প্রকোপ ভারতের চেয়ে কম এ বাংলাদেশে। স্ববিরোধী মনে হলেও সত্যি যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কম কৃতিত্ব নিয়েও পাকিস্তানে দারিদ্র্যের হার ৪-৮ শতাংশ; যা গবেষকদের ভাবায়।

এ নিবন্ধের শুরুতে জানিয়েছিলাম, তুলনামূলক আলোচনার অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিনায়ক সেন বাংলাদেশের প্রত্যাশিত/পূর্বজারিত (প্রেডিকটেড) ফলাফলের সঙ্গে অন্যান্য অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে যেমন নিম্ন ও নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের কৃতিত্ব, প্রকৃত কৃতিত্বের তুলনা বেছে নিয়েছেন এবং রিগ্রেশন ব্যবহার করে সামাজিক নির্দেশক ও মাথাপিছু আয় স্তরের মধ্যকার সম্পর্ক দেখার চেষ্টা করেছেন। দেখা গেছে বেশ কয়েকটা নির্দেশকে প্রকৃত অর্জন প্রত্যাশা বা প্রেডিকটেড মান অতিক্রম করেছে, কিছু ক্ষেত্রে করতে পারেনি; যার মধ্যে আছে বৈষম্য, নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য (১.৯ ও ৩.২ আন্তর্জাতিক রেখায়), খর্বতা ইত্যাদি।

পাদটীকা: 'আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তি সর্বতোভাবে জাগ্রত করা। আমরা যে আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি বসিয়া বসিয়া ফুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের গৌরব নহে; আমরা সেই ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই যখন সমাজের সর্বত্র আমরা উপলব্ধি করিব তখনই নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়া আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে।'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বদেশী সমাজ)।

'...মাঝে মাঝেই আমরা প্রলুব্ধ হয়ে ভুল পথে এগিয়ে গেছি কিন্তু তার মধ্যে ঠিক পথে যেটুকু এগিয়ে যাই তা যেন হারিয়ে না ফেলি। এখনো বহুপথ বাকি'—অমর্ত্য সেন (জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি)।

আব্দুল বায়েস: অর্থনীতির অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন শিক্ষক